তুই নিষিদ্ধ, তুই কথা কইস না

তসলিমা নাসরিন

এবার কলকাতায় আসাতক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। কোনও ঘটনাই, আমি বলবো না, যে, ঘটছে হঠাৎ করে। বেশ ক-বছর ধরেই একটু একটু করে লক্ষ্য করছি কলকাতার সাহিত্য-জগতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে উঠছে। চারদিকে কবিতা পাঠ হচ্ছে, উৎসবের ধুম পড়েছে, সকল কবিই আমন্ত্রিত, কেবল একজনই আমন্ত্রিত নয়, সে আমি। একজনই নিষিদ্ধ, সে আমি। শেষবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম বছর তিন আগে, আমন্ত্রণ পত্রখানি হাতে নিয়ে নন্দন চত্বরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেই, একজন বিখ্যাত কবি, যিনি সঞ্চালক ছিলেন, বলে দিলেন, আমার নাম তাঁর কবি-তালিকায় নেই, সুতরাং কবিতা পড়ার কোনও সুযোগই আমার হবে না। না, মঞ্চে ওঠার জন্য আমি মোটেও লালায়িত নই। শিরদাঁড়ায় অনুভব করেছি কিছু, পুরোনো কিছু, চেনা কিছু। সবকিছু থেকে আলগোছে আমাকে সরিয়ে দেওয়ার. মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বড় চেনা আমার। আমাকে নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত করে তোলার এই প্রক্রিয়াটি বড় চেনা। বড় কাছ থেকে দেখেছি এমন উপেক্ষা আমি, দেখেছি ছুড়ে ফেলা, বাতিল করা, একঘরে করা, দেখেছি বাংলাদেশে। আমাকে অচ্ছুৎ করার জন্য একদিকে মৌলবাদীরা ভীষণ রকম জাগ্রত, অন্যদিকে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিদীপ্ত বদভ্যাস। দুদলই তাদের নিষ্ঠা দেখিয়েছে কাজে। ধীরে ধীরে আমাকে বন্ধু হারাতে হয়েছে, ঘরবন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে কাটাতে কাটাতে একসময় এমনই এক বিভীষিকার রাত

এলো, যে রাতে বিতাড়িত হতে হয়েছে ঘর থেকে, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, দেশ থেকে। ওসব এখন শুধু স্মৃতি নয়, দুঃসহ দুস্বপ্ন-ও। ও-বাংলার নিষিদ্ধ মানুষটিকে ভালোবাসা দিয়ে বরণ করেছিলো এ-বাংলার কবিকূল। সে অবশ্য প্রথম প্রথম। দিন কিছু গেলেই তাড়াও তাড়াও। তাড়ানোর হরেক রকম কারণ আছে, কায়দা আছে। কলকাতায় অতটা ঘরবন্দি জীবন আমার শুরু না হলেও দুর্যোগের আভাস পাচ্ছি, দুর্দিন আসছে, কখনও নিঃশব্দে, কখনও হল্লা করে। বই নিষিদ্ধ হয়েছে, সরকারি এবং বেসরকারি আশকারায় আমার নামটিও নিষিদ্ধের তালিকায় উঠেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে উঠি, এ বাংলাদেশ নয় তো! ভয় হয়, এই রাজ্যটি বুঝি একটু একটু করে বাংলাদেশ হয়ে যেতে চাইছে! হয়তো চাইছে।

বাংলাদেশের বইমেলায় আমি ছিলাম নিষিদ্ধ, এ রাজ্যের মেলায় ধূলায় এখনও আমি নিষিদ্ধ হইনি। এখনও আমার শ্বাস ফেলার শ্বাস নেওয়ার সামান্য জায়গা অবশিষ্ট আছে। আমি না হয় নিষিদ্ধ সরকারি আপিসে, আস্তাবলে, না হয় নিষিদ্ধ বড় বড় কালচার-পাড়ায়, আমি নিষিদ্ধ নই সাধারন-অতি সাধারন মানুষের হৃদয়ে। বাঁচিয়ে আমাকে রাখে এরাই। এখনও বইমেলার নাম শুনলে রক্তে উত্তাল ঢেউ ওঠে। এখনও এক বইমেলা দেখতে সাত সাগর তেরো নদী পেরিয়ে চলে আসি এখানে, এই ধুলোবালির কলকাতায়। আসি প্রাণের টানে। আমি তো স্বীকারই করি যে পৃথিবীর কোনও বইমেলার সঙ্গে এই কলকাতা-বইমেলার কোনও তুলনা হয় না। এত যে বইমেলা বইমেলা, কিন্তু বাংলার বইমেলা কতদিন! একশ বা দুশ বছর পর এই মেলার দশা কি হবে, তা ভেবে আমার ভয় হয়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই বাংলা লিখতে পড়তে জানে না, এমনকী ভালো বলতেও জানে না, জানলেও বলে না বা বলতে চায় না। বাংলার প্রতি এদের

কোনও ভালোবাসা নেই। সম্ভবত ছোট খাটো কোনও গ্রাম গঞ্জের হতদরিদ্র চাষাভুষো মানুষের কাছেই বেশ কিছুকাল বেঁচে থাকবে বাংলা বইয়ের মেলা। বইমেলা যদি হয় কোথাও, হয়তো গ্রামের মাঠে ময়দানেই হবে। বাংলাভাষাটি ক্রমে ক্রমে অচ্ছুৎদের ভাষা হয়ে উঠছে, ক্রমে ক্রমে দীন-হীনের ভাষা। বাংলার জন্য আমি আপাদমস্তক দীনহীন হতে পারি। কিন্তু দীনহীনের ভাষা তো, এমনই নিয়ম, যে, বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাচ্ছে। বাংলা নামের একটি ভাষা ছিল জগতে, এটি একদিন হয়তো ইতিহাস হয়ে উঠবে, পূর্ববঙ্গে না হলেও এই পশ্চিমবঙ্গে। হয়তো হবে, হয়তো নয়। হয়তোর আভাস দেখি বেশি। বাংলা ভাষাটিকে নিয়ে বাঙালির লজ্জা হয় খুব। আমি সাধারণত বাংলায় বসে বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বলি না কারও সঙ্গে। বাংলায় বাস করা বিহারি ট্যাক্সিওয়ালা, মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী, উত্তর প্রদেশীয় কালাকার সকলের সঙ্গেই বাংলা চালিয়ে যাই, বুঝবে না তাই বলবো না -- এই ছুতোতে বা থিওরিতে আমি বিশ্বাসী নই। আসলে বোঝে তারা ঠিকই, কিন্তু ভাষাটি তাদের বোঝার এবং বলার সুযোগটিই কোনও বাঙালি দিতে চায় না। পৃথিবীর সব ভাষাই সুন্দর, সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করি কিন্তু বাংলায় বসে বাংলায় কথা বলার সুখ আমি পেতে চাই এবং এই সুখ অন্যকেও দিতে চাই। না, এতে মান যায় না, বরং মান বাড়ে। নিজেকে না ভালোবাসলে কেউ তেমন কিছু দিতে পারে না নিজের জীবনকে, তেমনই নিজের ভাষাটিকে ভালো না বাসলে, কেউ এই ভাষাভাষির মানুষকে এবং মাটিকে এই ভাষা যে মাটির, দিতে পারে না ভালো কিছু।

বাংলা বইয়ের প্রকাশকদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কথা বলে বিস্মিত হয়েছি যে টিভি, কমপিউটার, এমপি থ্রি, ডিভিডি ইত্যাদিতে মানুষ আঠার মতো লেগে থাকার পরও, যে রকম ভাবা হয়েছিল যে

বই বিক্রি কমে যাবে, মোটেও তা কমেনি। ইলেকট্রনিক বই উদয় হওয়ার পর পুস্তক প্রকাশকদের বদ্ধ ধারণা ছিল যে বই কেউ আর কিনবে না, না সেটিও হয়নি। একটি কথা খুব সত্যি, যে, ইন্টারনেট নামের জিনিসটি বই বিক্রি যেমন একদিকে বাড়িয়েছে, তেমন কমিয়েছে। বইয়ের খোঁজে দোকানে দোকানে ঘুরে এই বই পেলাম তো ওই বই পেলাম না সমস্যার শেষ নেই, কিন্তু ইন্টারনেটের দোকান থেকে বই খুঁজলে যে কোনও দেশের যে কোনও বইই পেয়ে যাচ্ছি, পেতে কয়েকটি ক্লিকের প্রয়োজন, কিনতেও মাত্র দু-চারটে ক্লিক। এরপর দুএকদিনের মধ্যেই বই একেবারে ঘরের দরজায় উপস্থিত। উপহার দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থাটি চমৎকার। কেবল ক্লিক। রীতিমত পছন্দের কাগজে বই মুড়িয়ে যে কথাটি লিখতে চাই, সে কথাটি জুড়ে দিয়ে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাকে উপহার দিতে চাই তার হাতে। ইন্টারনেটের দৌলতে এভাবেই বই বিক্রি বেড়েছে। আবার এর কারণে বই বিক্রি কিছু কমেছেও, কারণ ইন্টারনেটেই তাবৎ তথ্য মেলে। কোনও বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলে সেই বিষয়ের ওপর লেখা বই খুঁজে সেটি পুরো পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সময় এবং টাকা খরচ বিষম, কিন্তু ইন্টারনেটে সেই বিষয় বা তথ্য নিমেষেই পড়ে নেওয়া যায়। সময়ও বাঁচে, টাকাও বাঁচে। ঘটে বুদ্ধি থাকলে লোকে তাই করে আজকাল।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান এখন নেটে, আমাজন ডট কম। উনিশশ চুরানব্বই সালে আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বিজোস দেখলেন ইন্টারনেটের কাজকম্ম শতকরা দুহাজার দুশ হারে বাড়ছে। দেখে তার পরের বছরই তিনি বইয়ের দোকান শুরু করতে না করতেই একশ ষাটটি দেশের চেয়েও বেশি দেশের এক কোটি তিরিশ লক্ষের চেয়েও বেশি খদ্দের তিনি পেয়ে গেলেন।

আমাজন ডট কমে আছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বই, সিডি, ভিডিও; শুধু বই-ই এখন তিরিশ লক্ষ। ইন্টারনেটে ইদানীং বাংলা বইয়ের দোকানও প্রচুর হচ্ছে, ঝামেলার কিচ্ছু নেই, ক্রেডিট কার্ডের চল এ দেশে বাড়ছে, তবে আর পিছিয়ে থাকার কারণ কি! কারণ নেই, তারপরও ইচ্ছে করে , বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে উল্টে পাল্টে দেখে দেখে বই কিনি।

আজ না হোক, অদূর অথবা দূর ভবিষ্যতে একসময় হয়তো ইন্টারনেটের বইয়ের দোকানও উবে যাবে, বিশেষ করে সে দোকান যদি কাগজের বইএর দোকান হয়। বই বিক্রি আদৌ যদি হয়, ইন্টারনেটে ইলেকট্রনিক বই বিক্রি হবে। এরকমই তো গন্ধ পাচ্ছি চারদিক থেকে। কিন্তু মন মানে না। ইচ্ছে করে বইয়ের মেলা হোক মাস মাস, বছর বছর। ম্যালা বইয়ের মেলা হোক, হারিয়ে যাওয়ার খেলা হোক, ভালোবাসার বেলা হোক। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করতে পারবো আমি! আমি বিজ্ঞান বিরোধী নই মোটেও। বরং একটু বেশিরকমই বিজ্ঞান-বিশ্বাসী। তাই বলে রোবটে ছেয়ে যাক দুনিয়া, তা চাই না। মেশিনের ওপর বেশি নির্ভরতা কবে না জানি মনকেও মেশিনের মতো করে দেয়। মুড়িভাজা আর গরম চা খেতে খেতে পাতা উল্টে কাগজের বই পড়ার সুযোগ যদি ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা না পায়, তাদের জন্য আমার করুণাই হবে। কিছু জিনিস আছে, যে জিনিসের কোনও বিকল্প হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটি কি! বাংলাদেশে বই রফতানি করার পাট প্রায় চুকেছে বলতে হয়, এরপরও কি বই বেচা হচ্ছে না! হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষিত মানুষ যে হারে বাড়ছে, সে হারে পড়ুয়া বাড়ছে না। পড়ুয়া কারা বেশি! একবাক্যে কয়েকজন প্রকাশক জানালেন, মেয়েরা।

মেয়েদের পরের কাতারে আছে বাচ্চা। বাচ্চারা পড়ছে অনেক। কম পড়ের দলে আছে পুরুষ। কম পড়বে কিন্তু লিখবে বেশি। বেশি লেখার দলে কিন্তু পুরুষ, এবং কম লেখার দলে মেয়ে। পুরুষেরা বিদ্যে যত না আহরণ করে, তার চেয়ে বেশি বিতরণ করে। মুশকিল এখানেই। মেয়েদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, তারপরও মেয়েরা কেন কম লেখে! এর একটিই কারণ, সময় নেই। ঘরসংসার সামলাতে হয় মেয়েদের, বাচ্চা কাচ্চা, রান্না বান্না, মোট কথা সংসারের সাতশ রকম কাজে শারীরিক ভাবে, মানসিকভাবে, মনস্তাত্বিক ভাবে আটকে থাকতে বাধ্য মেয়েরা, তাই সৃষ্টিশীল কাজে, লেখালেখির কাজে, আঁকাআঁকির কাজে পুরুষের চেয়ে কম সময় পায় মেয়ে। এসব কাজকে তো এখনও কাজ বলে মনে করা হয় না, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। ঘরসংসারটা হলো সবচেয়ে পয়লা, এরপর যদি স্বামী বা শ্বশুর বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে চাকরি বাকরি বা টাকা পয়সা রোজগারের জন্য কাজকম্ম (তাও সব ধরনের কাজ নয়, যে ধরনের কাজকে মেয়েদের জন্য ভালো বা চলে বলে ধরা হয়, সেসব কাজই) করা যায় --- না হয় কষ্টে সৃষ্টে সেসব চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু লেখালেখি করার ফ্যাশনটা তো চলবে না বাপু। মেয়েদের জন্য এ হল ফ্যাশন, একধরণের বাড়াবাড়ি, ঢং, আহ্লাদ। মেয়েরা খুব সযত্নে বাড়াবাড়ি করা থেকে তাই নিজেদের বিরত রাখে। পুরুষতন্ত্রের সহায় মেয়েরা যত বেশি, তত হয়তো কোনও পুরুষও নয়। তাছাড়া মেয়েরা লেখাপড়াই বা করতে শিখছে কবে থেকে! পুরুষতন্ত্র তো এই সুযোগটি মেয়েদের দেয়নি।

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পার্থক্য এখন, কেউ লক্ষ্য করলেই দেখবে যে অনেকটাই কেটে যাচ্ছে। দেদারসে পাইরেট বেরোয় ও-দেশে। আজ এখানে শারদীয়ায় উপন্যাস ছাপা হলো,

ওখানে কাল সে উপন্যাস বেরিয়ে গেলো বই হয়ে। কে কাকে বাধা দেবে! এসবের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই, থাকলেও তার প্রয়োগ নেই । আমি অন্তত, এরকমই জেনেছিলাম, যে, জাল বই প্রকাশনার সুযোগ আর কোথাও থাকলেও এই পশ্চিমবঙ্গে নেই। কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াতেই প্রকাশকদের নাকের ডগায় দেখি জাল বই বিক্রি হওয়ার ধুম এবং এই ধুম নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা না হওয়া এবং কোথাও কোনও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর না ওঠা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। কে বা কারা এই জাল বইয়ের প্রকাশক, তা জানার সাধ্য অন্তত আমার মতো অসহায় লেখকের নেই। জাল বই লোকে কিনছে, দেড়শ টাকার বই শুনেছি দেড়হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লালবাজারের লোকেরা জাল বই ব্যাবসায়ীদের প্রতি সম্ভবত অত্যন্ত সহৃদয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোর বিরোধী তারা। অবৈধ ভাবে অবৈধ ব্যবসায়ীরা অবৈধ বই ছাড়ছে বাজারে, এই অভিযোগ বহু করা হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনও কোনও তাগিদ দেখায়নি অবৈধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। দ্বিখণ্ডিত নামের একটি বই বছর পার হয়ে গেল-- এ দেশে আজও নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই বইটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর সামান্য কিছু প্রতিবাদ হয়েছিল। প্রতিবাদে কাজ হয়নি, সরকার বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি। নিষিদ্ধ জিনিস শেষ অবদি নিষিদ্ধই থেকে গেছে। লেখকের মত প্রকাশের অধিকার, পাঠকের পাঠ করার অধিকার অবলীলায় কেড়ে নিয়েছে সরকার। আমার আশংকা হয়, নির্বিঘ্নে জাল বই বাজারে বিক্রি করে করে এরপর না স্বভাবই হয়ে দাঁড়ায় জাল বই ছাড়া যদি কলেজ স্ট্রিট ছেয়ে যায় জাল বইয়ে! ছেয়ে যায় চোরে, ডাকাতে, মিথ্যুকে, কালোবাজারিতে! দৃশ্যটি নিশ্চয়ই আমাদের কল্পনা করতে অসুবিধে হয়। দূর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে

দূর্নীতি মাথায় ওঠে। বাংলাদেশেও জাল বই একটা দুটো করে শুরু হয়েছিলো, কেউ তেমন গা করেনি, এখন ওখানে জাল বই ব্যবসায়ীদেরই দাপট বেশি। ঢাকার বাংলাবাজার এলাকায় পুস্তক প্রকাশকদের অনেকে ব্যবসা ছেড়ে পালিয়েছে, এক দল মাটি কামড়ে এখনও পড়ে আছে, আরেক দল নিজেরাই পাইরেসিতে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গ তো অন্তত শিক্ষা নিতে পারে এসব দেখে। পশ্চিমবঙ্গ তো অন্তত পাইরেসির বিরুদ্ধে যা হোক কিছু রা-শব্দ করতে পারে। বই নিষিদ্ধ করার যে আইনটি তিনি খাটিয়েছেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো অন্তত সেই আইনটি যথাযথ কায়েম করার চেষ্টা করতে পারেন। নাকি বইটির বৈধ প্রকাশকের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিয়ে অবৈধ প্রকাশককে বইটি ছাপাবার অধিকার দেওয়াই ছিল বই নিষিদ্ধ করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য? বৈধ বই পড়ে আছে লালবাজারের বদ্ধ ঘরে, অবৈধ বই-এ বাজার ছাওয়া। অবৈধের জয়জয়কার চারদিকে। নিষিদ্ধের পোয়াবারো।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু জনপ্রিয় পুরুষ-লেখক বাংলাদেশে প্রায়ই বেড়াতে যান মোগলাই খানাপিনা, অবাধ খাতির যত্ন আর খানসামাওয়ালা বাড়ির যারপরনাই আরাম পেতে, তাঁরা কিন্তু পাইরেসির বিরুদ্ধে মোটেও ওখানে মুখ খোলেন না। মুখ খুললে বিদেশের আরাম আয়েশ যদি কিছু কমে যায়! ওখানে আরও একটি মজার জিনিস তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, নারীসঙ্গ। মুসলমান নারীসঙ্গ। ব্যাপারটিই এক্সোটিক । মুসলমান মেয়ে, যাদের কথা ছিল বোরখার আড়ালে থাকার, তারা কিনা দিব্যি শাড়ি পরে কপালে টিপ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হেসে হেসে কথা কইছে, দেখলে গা শিরশির করে। ঘোমটা খুলে ফেললে তাদের বেশ মাল মাল লাগে। আর সেই মাল যদি কখনও ঠিক মালের মতো ব্যবহার না করে তখন কিন্তু

হিন্দু-লেখকদের বড় রাগ ধরে। আমার ওপর তাই বিষম রাগ এখানকার কিছু হিন্দু-লেখক বুদ্ধিজীবীর।এরা অবশ্য কিছু মুসলমান লেখক সঙ্গে নিয়ে বই নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বোকা মুসলমান লেখকদের ঘাড়ের ওপর নিষিদ্ধের দায়ও অনেকটা চাপানো গেল, মুসলমানের ধর্ম রক্ষা করার এই আহামরি আবেগ দেখিয়ে বেশ ধর্মনিরপেক্ষ সাজা গেল আর ওদিকে বাংলাদেশের আরাম আয়েশের ব্যবস্থাও বেশ পাকা রইলো, আর সাহিত্যজগতের পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম মেনে না চলার শাস্তিও আমাকে বেশ আচ্ছা করে দেওয়া হলো।

আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। যে মৌলবাদীরা আমাকে হত্যা করার জন্য দেশজুড়ে ক্ষেপে উঠেছিল, তাদেরও, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে যা খুশি তা বলার অধিকার আছে, যা প্রাণে চায় তা লেখার অধিকার আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম মানবী নামের একটি গল্প ছাপা হওয়ায় দেশ পত্রিকাটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং এই নিষেধাজ্ঞার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি, যদিও স্বয়ং লেখক আমার দ্বিখণ্ডিত বইটি নিষিদ্ধ করার জন্য জোর আন্দোলন করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন কারণ আমি মুসলমানের পয়গম্বরকে নিয়ে অসম্মানজনক কথাবার্তা লিখেছি দ্বিখণ্ডিত বইটিতে, এতে মুসলমানরা, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, খুব মনোকষ্ট পাবে এবং দেশ জুড়ে তাণ্ডব চালাবে। যাই হোক, অনেকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বই সাকসেসফুললি ব্যান হল এদেশে, ঠিক তার পর পরই ওদেশে, মুসলমানদের এক পয়গম্বর হযরত আদমের যৌনজীবন নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কল্পকাহিনী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত দিয়েছে বলে দেশ পত্রিকার সংখ্যাটি বাংলাদেশ-

সরকার নিষিদ্ধ করে। নিষিদ্ধ হওয়ার খবর বাংলাদেশের প্রতিটি পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হলেও পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কিন্তু ছাপা হয়নি। আমার কোনও ধারণাই নেই এই খবরটি এখানকার প্রচারমাধ্যমে পুরোপুরি চেপে যাওয়ার পিছনে কার বা কাদের হাত কাজ করেছে। পয়গম্বর মুহম্মদ নিয়ে ইতিহাস ঘেঁটে তথ্য দিয়ে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলাম আমি, বানিয়ে কিছু লিখিনি, তারপরও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তিনি যিনি পয়গম্বর আদম নিয়ে তাঁর লেখাটিকে মোটেও অনুচিত কাজ বলে মনে করছেন না। আমি ঠিক বুঝে পাইনা, দোষটি ঠিক কোথায় আমার। তবে কি কিছু কিছু পয়গম্বর সম্পর্কে লেখা যায় না, কিছু সম্পর্কে লেখা যায় ? অর্থাৎ বড় পয়গম্বর নিয়ে নয়, ছোট পয়গম্বর নিয়ে লেখা যায় বা যেতে পারে! যেতে পারলে মুসলমানের দেশে ছোট পয়গম্বরকে নিয়ে লেখা গল্প নিষিদ্ধ হয় কেন! তার মানে পয়গম্বর ছোট হোক বড় হোক, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখানোই ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। ইসলামকে দুধ কলা খাইয়ে লালন পালন করতে যে সব বাম-বুদ্ধিজীবী বদ্ধ পরিকর, তাঁদের নিশ্চয়ই জানা উচিত এটি। দোষটি কোথায় আমার, তবে এই কি আমাকে ভাবতে হবে যে কিছু লেখকের ছোট বড় যে কোনও পয়গম্বর নিয়েই লেখার অধিকার আছে এবং কিছু লেখকের নেই! নাকি কেবল পুরুষেরই সে অধিকার আছে, নারীর নেই! নাকি হিন্দু নামের লেখকদের সে অধিকার আছে, মুসলমান নামের লেখকদের নেই!

এখানে এ দেশেও দেখেছি পুরুষ লেখক-বুদ্ধিজীবীরা অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। তবে কি এটি শুধু তোমার জন্য! আমার জন্য নয়! কিছু একটা হবে হয়তো। কিছু একটা তো নিশ্চয়ই খুব গোপনে গোপনে কাজ করে। খুব গোপনে গোপনে এ দেশেও

হয়তো আমি পুরোদস্তুর অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে থাকবো, আমার দিকে চমৎকার হাসি হাসি মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকা শক্তিমান শত্রুরা হয়তো একদিন আমাকে আর কলকাতার বইমেলার চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেবে না, যেমন দেয়নি বাংলাদেশে। ভয় হয় একদিন হয়তো এদেশে আমার ঢোকার সব পথই বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে একটি আশংকা। এই আশংকা মৌলবাদীদের নিয়ে নয়, এ আশংকা মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, এ আশংকা বিখ্যাত পুং-সাহিত্যিকদের নিয়ে। বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদীদের আক্রমণের মুখে আমাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, এটা সত্যি কথা, কিন্তু মৌলবাদীদের আক্রমণের চেয়ে ভয়ংকর ছিল লেখক-বুদ্ধিজীবীদের হিমশীতল নীরবতা, এ নীরবতা কিন্তু অনেক অর্থে মৌলবাদীদের চিংকার চেচামেচির চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতিকর, হয়তো ওই নীরবতাই ছিল আমাকে নির্বাসিত করার আসল কারণ। যদি নীরবতারই এমন শক্তি থাকে আমাকে দেশ ছাড়া করার, তবে আমার অনুমান করারও শক্তি নেই বুদ্ধিজীবিদের শ্যেনদৃষ্টি আমাকে কোথায় কোন অন্ধকূপে শেষ অবদি ছুঁড়ে দেবে।

আমি এখানকার কোনও দলাদলিতে নেই। আমার কোনও দল নেই। গোষ্ঠী নেই। আমাকে যারা জন্মের শত্তুর বলে মনে করে, তাদেরও আমি অবন্ধু ভাবতে পারি না। এই না পারার স্বভাবটি জন্মগত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে কথা বলি। দ্বিখণ্ডিত বইটি লিখেছি বলে বিখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার আমাকে বেশ্যারও অধম বলে গালি দিয়েছেন, তাতে কী! দেখা হলে তাঁকেও আমি নমস্কার জানাই। শঙ্খ ঘোষকে চিরকালই শ্রদ্ধা করি। তাঁর হাতে গুজরাতের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানের জন্য আমি সাহায্য ঢেলেছিলাম, তারপর খুব বেশিদিন

হয়নি, মুসলমানদের পয়গম্বর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছি এই অভিযোগ করে দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ করায় সায় দিয়েছিলেন তিনি। কবীর সুমন, অশোক দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, আজিজুল হক, সুবোধ সরকার, কৃষ্ণা বসু, হাসমত জালাল, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এবং এমন অনেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কোনও কারণ কখনও ছিল না, এখনও নেই। তাঁরা নিজেরা লেখক হয়ে অন্য লেখকের বই নিষিদ্ধ করার জন্য পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, রেডিও টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, আদালতে গিয়েছেন --- এ সম্পূর্ণই তাঁদের নিজ নিজ আদর্শ, বিশ্বাস এবং রুচির ব্যাপার। আমাদের মতবিরোধ থাকতে পারে, তাই বলে একে অপরের ওপর হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও যুক্তি আমি দেখি না। মতের মিল নিয়ে এবং একইরকম করে মতের বিরোধ নিয়েও সুস্থ বিতর্ক কিংবা আলোচনা হতে পারে। সকলেরই বলার অধিকার আছে, মানুষ মাত্রেরই আছে। কিন্তু এখানকার নামি দামি পুরুষ-কবিলেখকদের কোনও অশোভন আচরণ বা অন্যায় নিয়ে লক্ষ করেছি, মুখ খোলা, পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট। এঁদের নমো নমো করে চলার নিয়ম এখানে, নিয়মটি ভাঙলেই সব্বোনাশ। নিয়মিত গুরু দক্ষিণা দিয়ে শিষ্যজাতিকে বেঁচে থাকতে হয়। নামি দামিদের শক্তি এবং দাপট এ অঞ্চলে খুব বেশি। তাঁরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বাস করেন বলেই সম্ভবত এই দাপট। টার্গেট যদি একবার হয়ে বসো, সাহিত্য-রাজনীতির সন্ত্রাস, তুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুঁটি হলেও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। মাফিয়া কোথায় নেই! যে বুদ্ধিজীবী মহাশয়গণ বুদ্ধি বিক্রি করে জীবন যাপন করেন, যাঁদের বুদ্ধিতে সমাজের অনেক কিছু ভাঙে এবং গড়ে ওঠে, সেই বুদ্ধিজীবীরা যদি ক্ষুদ্রতা নীচতা হীনমন্যতা ইত্যাদির উর্ধে উঠতে না পারেন, তবে

তাঁদের কতটুকু ক্ষতি হয় জানি না, অনেক বেশি ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। কারণ সাধারণ মানুষেরা বুদ্ধিজীবী থেকেই শেখে অনেক কিছু।

তারপরও, আমাদের ঈর্ষা ভালোবাসা আমাদের ঘৃণা গৌরব সব কিছুর মধ্যেও হৈ রৈ করে উৎসবের দিন আসে। শীত জুড়ে মেলা বসে এই বাংলায়। বইয়ের মেলা শুরু হচ্ছে। বিশাল মাঠের ঝলমলে বইমেলায় বইপ্রেমীদের ভিড় বাড়বে প্রতিদিন। গত বছরের মতো এবারও হয়তো দ্বিখণ্ডিত নামের নিষিদ্ধ বইটির খোঁজ করবে অনেকে, পাবে না। বইমেলার কোনও বড়কর্তার হয়তো মনেও হবে না একবার, অন্তত মেলার এই দিনগুলোয় বই-নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীরও হয়তো তা মনে হবে না, সাম্যবাদে বিশ্বাসী, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কারওরই তা মনে হবে না। আমরা খুব সহজে ভুলে যাই অনেক কিছু। আমরা যা ভুলতে চাই, তা-ই বোধহয় ভুলে যাই।

সমাজে কত রকম অন্যায় ঘটছে, কত রকম অনাচার আমরা মেনে নিচ্ছি। মানুষ বাস করতে পারছে না মানুষের ন্যূনতম অধিকার নিয়ে। তবু আমরা খুব অনায়াসে অবর্ণনীয় সব দারিদ্র মেনে নিচ্ছি, কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছে বলে সুস্বাদু খাদ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি না। মেনে নিচ্ছি ধনতন্ত্রের বিশ্বায়ন, মেনে নিচ্ছি কুৎসিত পুরুষতন্ত্র, মেনে নিচ্ছি রাজনীতিকদের মিথ্যাচার, মেনে নিচ্ছি প্রশাসনের দুর্নীতি, এত কিছু মেনে নেওয়ার চরিত্র যাদের, বই নিষিদ্ধ হওয়ার মতো তুচ্ছ জিনিস মেনে নিতে তাদের কোনও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ নিতান্তই ডালভাত। আমি তো আস্ত বাঙালি, বইয়ের নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে এই যে হঠাৎ হঠাৎ বেওকুফের মতো চমকে উঠি, ধমকে উঠি; উঠি, নিজের বই বলেই হয়তো উঠি।